এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে আকুল হয়ে ডাকতেন, ''ওরে তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়!'' সে-ডাক গিয়ে পৌঁছেছিল 'সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন' অর্থাৎ জগতের দাগ না লাগা শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেদের প্রাণে। একে একে অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা এসে জড়ো হয়েছিলেন অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে। অপরদিকে শ্রীশ্রীমায়ের পার্ষদেরা এসেছিলেন নীরবে, গোপনে, আত্মপরিচয় বিলুপ্ত করে।

''এ তো বেশ ভাল মেয়ে। কার বাড়ির মেয়ে?'' —শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সুধীরা দেবীকে। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সুধীরা তাঁর এক ছাত্রী পারুলকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন গিয়েছিলেন মার কাছে। জগজ্জননী দেখেই চিনে নিয়েছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ 'একেবারে কোলের মেয়ে'টিকে—যে-কাজের জন্য নিজে অবতীর্ণ হয়েছেন তার কিছু একে যন্ত্র করেই করিয়ে নেবেন তিনি। অবশ্য পারুল এর আগেও মাকে দর্শন করেছে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। ছোট্ট পারুল নিবেদিতার মুখে শুনেছিল 'তিনি মাতাদেবী'। ভেবেছিল, যেহেতু তিনি 'দেবী,' নিশ্চয় তাঁর চার হাত থাকবে, মাথায় মুকুট। অথচ সেদিন বাস্তবে সেসব কিছু না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে শুধুমাত্র একটা প্রণাম করেই বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন মা, তেমনই তাঁর মেয়েরা। ধৈর্যে, সহ্যে, বিশ্বাসে, নিষ্ঠায়, বৈরাগ্যে তাঁদের অন্তর পরিপূর্ণ, কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কত সহজ—'মা' বলে ডাকতে এতটুকু সংকোচ হয় না। মায়ের এরকমই মেয়ে ছিলেন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী।

আগে বৈরাগ্য তারপর গৃহত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা ও নিভৃতে গোপনে মন্ত্রসাধনা—শাস্ত্রোল্লিখিত নির্দেশগুলি পারুলের জীবনে উজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করেছিল। কাশী, বৃন্দাবনে তাঁর সম্বল ছিল শুধুমাত্র জপের মালা আর কথামৃত। শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে মন্দিরের প্রসাদ 'পারস' ধারণ এবং সারাদিন জপধ্যান—এই ছিল তাঁর রোজনামচা। ১৯১৩ সালে কলকাতায় আসেন শ্রীশ্রীমার কাছে। ক-মাস পরেই ডাফরিন হসপিটালে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করতে যান। জপধ্যানে যেমন নিষ্ঠা ছিল, সেই একই নিষ্ঠা নিয়ে বিদ্যার্জন করলেন। ১৯১৭ সালে পরীক্ষায় প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হলেন। তারপর তপস্যার ভাবে শ্রীশ্রীমার সেবা। দেহত্যাগের আগে মা তাঁকে বলেছিলেন, ''শেষে আমার কাছেই তো আসবে।

তবে আমার কিছু কাজ আছে তা করে তারপর আসবে।" ১৯২০ সালে মা একথা বলেন, সেই কাজের ডাক এল ১৯৫৪ সালে। ১৯২৭ থেকে ১৯৫৪—এই সাতাশ বছর কাশীতে সরলা তপস্যা করেছিলেন শরীর-মন ভুলে। একবার মধ্যরাত্রে জপ করছেন। শুনতে পেলেন ঘণ্টার আওয়াজ। মনে হল কাছে কোনও মন্দিরে পুজো-আরতির ঘণ্টা বাজছে। বুঝতে পারছিলেন না ওই সময় কোন মন্দিরে পুজো হতে পারে। সকাল হয়ে গেল, তখনও ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জপ থেকে উঠে অন্যত্র গেলেও ঘণ্টাধ্বনি থামল না। শেষে অদ্বৈতাশ্রমে গিয়ে পূজনীয় 'কেদারবাবা'কে [স্বামীজীর শিষ্য স্বামী অচলানন্দ] ওই কথা বলাতে তিনি বললেন, ''আরে, ওই তো অনাহত ধ্বনি শুনছিলে, কোনও মন্দিরে নয়।"

এ-হেন জীবনটি যখন ফুলে-ফলে পল্লবিত বিরাট মহীরূহ হয়ে মানুষকে শীতল ছায়াদান করছিলেন তখন তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। অন্য সকলের থেকে তিনি কোথাও একটু ভিন্ন ধরনের মানুষ, খুব সহজে তাঁর কাছে যাওয়া যায়, মনের কথা বলা যায় অথচ তিনি কত উচ্চস্তরে বিচরণ করেন তাও অনুভূত হত। অন্য গুরুজন মাতাজীদের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা অনুভব করতাম। কিন্তু ভারতীপ্রাণামাতাজীর কাছে কোনও সংকোচ হত না। কত যে দরদি অথচ কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখতেন! তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা।

তাঁর প্রতিদিনের জীবনযাত্রা ছিল বীণার তারে বাঁধা। এতটুকু তাল কাটবার জো ছিল না। ভোর তিনটেয় উঠে জপধ্যান, তারপর গঙ্গাস্নান সেরে ঠিক সাতটায় ঠাকুরঘরে এসে ঠাকুরের নৈবেদ্যের ফল কেটে দিতেন। ঠাকুরের স্নানের ঘণ্টা শোনামাত্র তাড়াতাড়ি নৈবেদ্য সাজিয়ে গর্ভমন্দিরে পাঠিয়ে দিতেন। বলতেন, ''স্নান করে ঠাকুর বসে থাকতে পারেন না, তাঁর খিদেয় কষ্ট হয়।" লীলাময় ঠাকুর একদিন তাঁর সঙ্গে অদ্ভুত লীলা করলেন। তাঁর নৈবেদ্য গোছানো শেষ, ঠাকুরের স্নানও আরম্ভ হয়ে গেছে, এমন সময় এক ভক্ত ঠাকুরের জন্য এক বাক্স ভাল সন্দেশ এনেছেন। তাড়াতাড়ি তাক থেকে আর একটি থালা নামিয়ে মিষ্টিগুলি সাজাতে সাজাতে তিনি নিজের মনেই বলছেন, ''রোসো বাপু, এতসব খেতে চাইলে একটু অপেক্ষা করতে হয়।" কথাগুলি শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল খুব নিকট আপনজনের জন্য খাবার গুছোচ্ছেন। আপনবোধে কীভাবে ঈশ্বরের পুজো করতে হয়, তিনি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাপনে তা শিখিয়ে গেছেন। কোথাও এতটুকু আড়ম্বর নেই, অথচ সব কাজেই আন্তরিকতার নিবিড় স্পর্শ। পুজোশেষে নিজের ঘরে যেতেন, হাতে থাকত ছোট একটি পুষ্পপাত্র। তাতে ফুল, বেলপাতা, চন্দন ইত্যাদি সাজানো থাকত। তাঁর ঘরে রাখা বহু বছর ধরে তাঁর পূজিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ছবিতে অর্ঘ্য দিতেন। তারপর আবার জপধ্যান ও গীতাপাঠে ডুবে যেতেন। ঠিক দশটায় ঘর থেকে নেমে এসে জলখাবার খেতেন। দীক্ষার্থী কেউ এলে, ঠাকুরের পুজো শেষ করে পূজারিণী বেরিয়ে আসার পর ঠাকুরঘরে গিয়ে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষাশেষে যখন বেরিয়ে আসতেন, মুখের ভাবে এক অবর্ণনীয় পরিবর্তন লক্ষ করতাম। আমরা তখন তাঁকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করতাম।

আমরা তাঁকে 'মা' বলতাম, সেভাবেই এই প্রবন্ধে উল্লেখ করছি। দুপুরবেলা প্রথম ব্যাচে যারা পরিবেশন করত, দ্বিতীয় ব্যাচে তারা, পূজারিণী এবং ভাণ্ডারীর সঙ্গে বসে মা প্রসাদ পেতেন। একদিন প্রসাদ পেতে বসে মা বাইরের বারান্দা থেকে শ্রুতিপ্রাণাজীর গলা পেলেন (তখন শ্রুতিপ্রাণাজী ভাণ্ডারের দায়িত্বে)। তিনি ঘরে ঢুকলে মা জিজ্ঞাসা করলেন, ''কাকে কী বলছিলে?"

''দেখুন না মা, এই সুবাসিনী (রাঁধুনি) আর শীতল (সহকারী কাজের মেয়ে) কুটু (দক্ষিণী খাবার) খেতে চাইছে না। আমি বললাম, এখানে কত ছোট ছোট মেয়েরা (ব্রহ্মচারিণীরা) রয়েছে, তারা হাসিমুখে সব খাচ্ছে, আর তোমরা পাতেই নিতে চাইছ না!''

মা বললেন, ''দেখো রাবেয়া (শ্রুতিপ্রাণাজীর পূর্বনাম), ওরা পেটের জন্য কাজ করতে এসেছে, ওরা যা খাবে, তাই ওদের দেবে। আর যারা সাধু হতে এসেছে, তাদের তুমি যা দেবে, তারা তাই খাবে।'' কত সহজে সংসারজীবন আর আধ্যাত্মিক জীবনের ('যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ') পার্থক্য বুঝিয়ে দিলেন। আবার সাধুজীবনে সংযম ও নিষ্ঠার গুরুত্ব আচরণে, কথায় বুঝিয়ে দিতেন।

ষাটের দশকে একবার গার্ডেন রিচ থেকে ভক্তেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবের দিনে একটি বাস ভাড়া করে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। দলের মধ্যে কয়েকজন শিশুও ছিল। ফেরার সময় ভিড়ের মধ্যে একটি ছোট মেয়ে হারিয়ে যায়। মঠ অফিস থেকে মেয়েটির নাম ঘোষণা করা হলেও তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। অগত্যা ওই দলের এক মহিলা—যিনি ছিলেন ভারতীপ্রাণামাতাজীর শিষ্যা—তিনি মাকে ফোন করে মেয়েটির কথা জানালেন আর কাতরভাবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ''যেখানে তোমাদের বাস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে গিয়ে দেখো।'' ওখানে গিয়ে ওঁরা দেখেন সত্যিই বাসের কাছে একটি গাছতলায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে পরে মার কাছে জানতে চান তিনি কী করে জানতে পারলেন মেয়েটি ওখানে রয়েছে। মা বললেন, ''সেটা আর কিছুই না—মনটাকে একটু একাগ্র করলেই জানা যায়।''

পরে এ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন, দূরে সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীরা তীর্থে গেলে তিনি ইচ্ছা করলেই দেখতে পান তারা কোথায় কেমন আছে, কী করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, পরমহংস দু-পাঁচজন শিশু বা বালক কাছে রাখেন ভাব আরোপের জন্য; পরমহংসের বালকস্বভাব। ভারতীপ্রাণামাতাজীরও শিশুপ্রীতি এবং বালকবৎ আচরণ আমাদের উপভোগের বিষয় ছিল। মঠে সন্ধ্যারতির সময় পাড়ার দু-চারটি বালিকা আসত। তখন ঠাকুরঘরের ভেতরে বসে মা জপ করতেন। ভজনের পর মহিলারা মাতাজীকে নাটমন্দিরের বাইরের বারান্দায় প্রণাম করতেন, তখন ছোটদের মধ্যে দু-একজন তাঁকে গান গেয়ে শোনাত, কেউ বা মজার ছড়া আবৃত্তি করত। মাতাজী ছোটদের সঙ্গে থাকতে খুব ভালবাসতেন। ওদের সঙ্গে মিশে একেবারে শিশুর মতো হয়ে যেতেন। ওদের বলা ছড়াগুলো মনে রেখে পরে আমাদের শোনাতেন। ওঁর বলা এরকম একটা ছড়া আমার আজও মনে আছে—

তিড়িং মিড়িং লাফায় চিংড়ি, ট্যাংরামণির বিয়ে।
খোলক দাদা ঢোলক বাজায় খ্যাংরাকাঠি দিয়ে॥
ইলশে পিসি খলসে মাসি রং মেখেছে গায়।
রুই কাকা কাতলা মামা পাতলা চোখে চায়॥
ছাদনাতলায় বর এসেছে টোপর মাথায় দিয়ে।
উলু দিয়ে শঙ্খ বাজায় ট্যাংরামণির বিয়ে॥

ছোটদের মুখে গল্প শুনতেও মা খুব ভালবাসতেন। এমন অনেক দিন হয়েছে, রাতে প্রসাদ পাওয়ার পর পাঠের আগে মোক্ষপ্রাণামাতাজী মাকে ছোটদের গল্প পড়ে শুনিয়েছেন। মা শুধু শুনতেন না, মনেও রাখতেন। একবার রাতে পাঠের পরে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''খুরঘর্ষণং খুরঘর্ষণং শিলে টপ টপ পানি/তোমার যে মনের কথা সে তো আমি জানি—এই ছড়াটা যে-গল্পে ছিল, সেই গল্পটা তোমার মনে আছে?'' উত্তর দেব কী, ওঁর কথা শুনে আমি তো অবাক! প্রায় বছর চার-পাঁচ আগের ঘটনা। একদিন রাতে

পাঠের আগে মোক্ষপ্রাণাজী গল্পটি মাকে শোনাচ্ছিলেন, সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। এত বছর পরেও সেই গল্পের কথা ওঁর মনে আছে! শুধু তা-ই নয়, আমি যে উপস্থিত ছিলাম সেটাও মনে আছে! আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, পুরো গল্পটা তিনি আমায় শোনালেন! সেদিন তাঁর মধ্যে বালকভাবের মধুর প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলাম; একইসঙ্গে প্রখর স্মৃতিশক্তি!

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। রাতে ঠাকুরের ভোগ উঠে যাওয়ার পর আমরা মায়ের ঘরে ভিড় করেছি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা পাঠ হচ্ছে। সেখানে এক জায়গায় রয়েছে, মহারাজ মঠের একটি শাখাকেন্দ্রে গিয়ে দেখেন সেখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ জনৈক নবাগত ব্রহ্মচারীর প্রতি বিরূপ। সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রহ্মানন্দজী এক অদ্ভুত উপায় বাতলালেন। ব্রহ্মচারীকে শালিক পাখির বুলি শিখিয়ে দিলেন—রিরিরী, কটকটকট, পাপীচ পাপীচ, খেন্দিকির্কিচ্, কিদার্কিচ্, ইশন্ মিশন্ ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্, কিষ্টকিশোর কিষ্টকিশোর, ডুগডুগাডুগ, প্লীং প্লাই। কীভাবে বুলি আওড়াতে হবে, 'প্লীং প্লাই' বলার সঙ্গে সঙ্গে কীরকম ভঙ্গি করে সরে পড়তে হবে—এসবও শেখালেন। উৎসবের দিনে অধ্যক্ষ মহারাজের উপস্থিতিতে তাকে ডেকে শালিক পাখির বুলি অভিনয় করে দেখাতে আদেশ করলেন। দেখে শুনে অধ্যক্ষ সহ সকলে হেসে খুন। সেদিন থেকে ব্রহ্মচারীর প্রতি অধ্যক্ষ মহারাজের বিরূপভাব একেবারে উধাও হয়ে গেল। এদিকে পাঠ শুনে মায়েরও ওই বুলি দারুণ ভাল লেগে গেল। বারবার আওড়াতে লাগলেন। পরদিন সকালের রুটিনশেষে মা বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় কোথা থেকে এক শালিক এসে বারান্দার গ্রিলে বসে তার নিজস্ব সুরে ডাকতে শুরু করেছে। মা সঙ্গে সঙ্গে তাকে নকল করে বলতে লাগলেন—রিরিরী কটকটকট প্লীং প্লাই—বলছেন আর হাসছেন। সেই দৃশ্য দেখে আমরাও হাসি চাপতে পারলাম না। নকল করতে পারার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল মায়ের। ভগিনী নিবেদিতা, যোগীন মা, শরৎ মহারাজ—সকলের কথা এমন নকল করে দেখাতেন যে, আমরা তাঁদের মানসচক্ষে দেখতে পেতাম। মনে হত মা নন, তাঁরাই আমাদের সামনে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। শুধু কথা নয়—নিবেদিতার হাঁটা, চাহনি সব নকল করতেন। সেইসময় একটি দেবভাবের স্ফুরণ হত।

মা সারদা মঠের অধ্যক্ষা ছিলেন কিন্তু কখনও তাঁর কোনও কথায় বা কাজে কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠত না। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল ঠাকুর-মা-স্বামীজী মঠ চালাচ্ছেন। ঠাকুরঘরের সামনে পা টিপে টিপে যেতে বলতেন, পাছে পায়ের শব্দ তাঁদের কানে পৌঁছয়। ঠাকুরবাড়িতে জোরে কথা বললে বা জোরে হাসাহাসি করলে মা খুব রাগ করতেন, বলতেন, ''তোমরা ভাবছ ঠাকুরঘরে তাঁরা কেবল ছবি? তাঁরা সাক্ষাৎ রয়েছেন। তাঁরাই মঠ চালাচ্ছেন।'' তাই গরম-শীত বুঝে জানালা খোলা বা বন্ধ রাখা, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর গায়ে পাতলা বা গরম চাদর দেওয়া—সব নিয়ন্ত্রিত হত। প্রতিটি কাজ ভাব নিয়ে করতে হয়—এইটি নিজে আচরণ করে তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি কাজ করতেন কী অসাধারণ মনঃসংযোগের সঙ্গে। কারও হাত থেকে জিনিস পড়ে গেলে বা কেউ কোনও জিনিস কোথায় রেখেছে মনে করতে না পারলে মা খুব অসন্তুষ্ট হতেন। বলতেন, ''মন কোথায় থাকে? কোনও জিনিস যখন রাখছ, সমস্ত মন দিয়ে 'এই জিনিসটা এখানে রাখছি' বলে রাখবে। তাহলে ভুল হবে না। অন্যমনস্ক হয়ে কোনও কাজ করবে না। সমনস্ক সদাযোগী। সদাজাগ্রত কুড়নো মন থাকা চাই।''

তখন মঠে বা কলকাতার কোনও কেন্দ্রে গাড়ি ছিল না। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সময়ে

সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীরা একজন বা দুজন মঠে আসতেন কোনও কাজে। তাঁরা যখন ফিরবেন, মা দেখতেন কোনও ভক্ত গাড়ি করে এসেছেন কি না। যদি সেরকম কোনও গাড়ি থাকত, যারা নিজ কেন্দ্রে ফিরবে তাদের ওই গাড়িতে মা তুলে দিতেন—যাতে গাড়ি করে সে যতদূর সম্ভব যেতে পারে। সকলের প্রতি ওই ভালবাসায় আমরা শ্রীশ্রীমার প্রতিফলনই দেখতাম।

ছোট-বড়, ভক্ত, ভৃত্য সে যে-ই হোক—সকলের প্রতি মায়ের ছিল সমান দরদ। বিশেষত নতুন যারা মঠে যোগ দিতে আসত, তাদের প্রতি মায়ের ছিল প্রগাঢ় স্নেহ। দোলপূর্ণিমায় ঠাকুরপূজা শেষ হওয়ার পর নাটমন্দিরে গান হয়। তারপর কীর্তন সহযোগে মন্দির পরিক্রমা আর আবির খেলা। মায়ের সময় মন্দির তৈরি হয়নি, মঠবাড়ি পরিক্রমা হত। মা উৎসাহের সঙ্গে সেই আনন্দোৎসবে যোগ দিতেন। শুধু তা-ই নয়, খেলাশেষে গঙ্গায় কোমরজলে দাঁড়িয়ে, ব্রহ্মচারিণীদের চুল থেকে রং তোলার জন্য তাদের মাথায় সস্নেহে সাবান ঘষে দিতেন। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। সে যে কী যত্নে করতেন তা বলে বোঝানো যাবে না।

ব্রহ্মচারিণীদের মধ্যে আবার যারা বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে যোগ দিত, মা তাদের বাবা-মাকেও আধ্যাত্মিক পথে চলতে সাহায্য করতেন। একজন ব্রহ্মচারিণীর মাকে তিনি নিজে ডেকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, আর বাবা নিয়মিত গায়ত্রী জপ করেন জেনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর আর আলাদা মন্ত্রদীক্ষার প্রয়োজন নেই।

নিজে কোনওদিন সংসার করেননি, অথচ সংসারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করত। প্রয়োজনমতো মা ব্যবস্থাও নিতেন। মানুষ বুঝে অধ্যাত্মবোধ জাগাতেন। মনে আছে, একবার স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ এক মহিলাকে মঠে রাঁধুনির সহকারী হিসেবে থাকতে দিয়েছিলেন। ভাল দিন দেখে মা তাঁকে মন্ত্রদীক্ষাও দেন। সেই মহিলা নিরলসভাবে মঠের সেবা করে গেছেন আজীবন। খুব কম কথা বলতেন। করণীয় সমস্ত কাজ করতেন অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে, আর দিনরাত জপ করতেন।

মায়ের চরিত্রের যে-দিকটি আমাকে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করত, তা হল তাঁর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। যখন যিনি বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, মা তাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিভূ জ্ঞান করতেন। তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন, সে-বিষয়ে নিজের কোনও মতামত দিতেন না। কাশী থেকে মা জয়রামবাটী গেছেন ১৯৫৩ সালে শ্রীশ্রীমার জন্মশতবর্ষ উৎসবে—স্বামী শংকরানন্দ সেখানে তাঁকে জানান যে মেয়েদের মঠ হচ্ছে—তার ভার তাঁকে নিতে হবে। প্রথমে ইতস্তত করলেও সঙ্ঘের আদেশ মা মাথা পেতে নিলেন—স্বাধীন একক জীবন ছেড়ে ষাট বছর বয়সে এই গুরুভার বহন করতে রাজি হলেন। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মায়ের কাজ মা-ই তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। অহমিকার সম্পূর্ণত অভাব ছিল তাঁর চরিত্রে। বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি-বিশ্বাস, নিষ্ঠা—এইসব দৈবী সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন ভারতীপ্রাণামাতাজী।

১৯৫৪ সালে বেলুড় মঠের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ সারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করে নির্দেশ দিয়েছিলেন, স্ত্রীমঠে ঠাকুরকে সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোগ দেওয়া হবে। ভারতীপ্রাণামাতাজী নির্দ্বিধায় সেই আদেশ মেনে নিলেন। সেসময় মঠের রান্নায় পেঁয়াজ পর্যন্ত ব্যবহার হত না। দীর্ঘ দশ বছর পরে মঠের নবম অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ আদেশ দিলেন, ''ঠাকুরকে শনি-মঙ্গলবার ভোগে মাছ দিতেই হবে। মঠটাকে বৈষ্ণব বাবাজীদের আখড়ায় পরিণত করবে না।'' এবারেও মা বিনা

প্রতিবাদে সেই আদেশ মেনে নিয়ে ১৯৬৪ সালে ফলহারিণী কালীপূজার দিন প্রথম আমিষ ভোগের ব্যবস্থা করলেন। নিজেও প্রসাদ ধারণ করলেন।

এই ছিলেন ভারতীপ্রাণামাতাজী। জীবনের বেশিরভাগ সময়টা যিনি স্বাধীনভাবে সাধনভজনে কাটিয়েছেন, সেই তিনি কত সহজে মঠে সবার সঙ্গে মিলেমিশে শেষজীবনটা কাটিয়ে দিলেন। তাঁর কাছে সারদা মঠ আর শ্রীশ্রীমা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৪ সালে সারদা মঠ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরে, ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে এটি স্বাধীন স্ত্রীমঠ রূপে পরিচিত হল। তার আগে পর্যন্ত এটি বেলুড় মঠের শাখা হিসেবে গণ্য হত। ভারতীপ্রাণামাতাজী আর ছয়জন সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে তৈরি হল অছি পরিষদ। অনেক সময় হয়তো মায়ের ব্যক্তিগত মতামত আর অছি পরিষদের মতামত আলাদা হয়েছে, তবু মা কিন্তু নিজের মতামত কারও ওপর কোনওদিন চাপিয়ে দিতেন না, অছি পরিষদের সিদ্ধান্তই মেনে নিতেন। সঙ্ঘরূপিণী শ্রীশ্রীমাকে কীভাবে অন্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন তা দেখার মতো। যথার্থ অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ না হলে এটি সম্ভব হত না। একবার সিদ্ধান্ত হল, জনৈক ব্রহ্মচারিণীকে মাতৃভবনে কর্মী হিসেবে পাঠানো হবে। মা তো মিটিং থেকে বেরিয়ে শিশুর মতো ওই ব্রহ্মচারিণীকে সব বলে দিলেন। সে মায়ের কাছে অনুযোগ করল, কেন মা এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন! তিনি একবার 'না' বললেই তো সিদ্ধান্ত খারিজ হয়ে যেত! মা হেসে বললেন, ''ওগো, তা কি বলতে পারি? তাহলে তো মন্ত্রীরা রাজার গলা ঘ্যাচাং করে কেটে দেবে!'' আর একবার এক ব্রহ্মচারিণীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কঠোর ব্যবস্থায় মার সায় ছিল না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিলেন।

আমার ক্ষেত্রে ঠিক এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬৩ সালে অছি পরিষদ আমাকে নিবেদিতা স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। আমি তখন সবেমাত্র একটু-আধটু বাংলা শিখছি, সেই অবস্থায় স্কুলের ছাত্রীদের বাংলায় বিজ্ঞান পড়ানো আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কী আর করি! মায়ের কাছে গিয়ে আমার অসহায় অবস্থার কথা বললাম। মা আমার মনের ভার হালকা করার জন্য বললেন, ''তুমি ক্লাসে গিয়ে বলবে—I don't know Bengali.'' কিন্তু একবারও আদেশ পরিবর্তনের কথা বললেন না। শেষপর্যন্ত আমাকে নিবেদিতা স্কুলে যেতেই হল—হাবুডুবু খেতেই হল।

এরপর আরও দশ বছর কেটে গেছে। ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি। নিবেদিতা স্কুল থেকে মঠে এসেছি। অসুস্থ ভারতীপ্রাণা মা শুয়ে আছেন নতুন বাড়ির পশ্চিমের ঘরটিতে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে অনেক উৎকণ্ঠিত মুখ। সমবেত উচ্চারণে 'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' ধ্বনিত হচ্ছে। আমিও ঘরে গিয়ে বসলাম। মা অস্ফুটে উচ্চারণ করছেন—'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।' আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এভাবেও মৃত্যুবরণ করা যায়! রোগযন্ত্রণাকাতর শরীর থেকে মনকে সরিয়ে এনে পরব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁতেই লীন হয়ে গেলেন।

তাঁর দেহ চলে গেছে। সূক্ষ্মভাবে রয়ে গেছে তাঁর তপস্যার ধারা। স্বামীজী বলেছিলেন, মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি ব্রহ্মজ্ঞা হন, কালে তাঁর প্রভাবে হাজারো মেয়ে জেগে উঠবে। ভারতীপ্রাণা-মাতাজীকে দেখলে স্বামীজীর বাণীর সত্যতা অনুভূত হয়। তাঁর তপস্যা অন্তরাল থেকে উদ্দীপিত করবে ভবিষ্যৎ ভারতের মেয়েদের। মেয়েরা বস্তুজগতকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অক্লেশে বলতে পারবে, ''যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?'' ✠